***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 182–193*
*Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*e ISSN : 2583 – 0848 (Online)*

# স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজ ও সময়ের ভিন্নস্বর

হরিপদ হেম্ব্রম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া
ই-মেইল : haripadahembram82@gmail.com

## Keyword
আদিবাসী সাঁওতাল, সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রতিরোধী, প্রতিবাদী স্বর, কণ্ঠরোধ, অভিঘাত, প্রান্তিক, জাতিগোষ্ঠী

## Abstract
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের আখ্যানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি, সংস্কার-প্রথা, বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন, সৃষ্টি রহস্য, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের আচার, সমাজ সংগঠনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তাদের শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সামগ্রিক সত্তা ইত্যাদি তুলে ধরার ক্ষেত্রে বাংলা ঔপন্যাসিকদের অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক ধরে রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও শিল্পনীতির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। এই সময় থেকেই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রেম কাহিনীর ভাঙাগড়া নিয়ে উপন্যাস লেখার ক্লান্তিকর রাস্তা থেকে সরে এসে আদিবাসীদের মনুষ্যত্বের ন্যূনতম অধিকার নিয়ে উপন্যাস লেখা শুরু হয় এবং মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সঙ্গে প্রান্তিক সংস্কৃতির মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের মূল স্রোতে তাদের ফিরিয়ে আনতে মধ্যবিত্তের সহৃদয়তা, দায়িত্ববোধ, আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবন ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে বাঙালি মধ্যবিত্তের দায়বদ্ধতা ইত্যাদি আদিবাসী চর্চার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

আদিবাসী সাহিত্য চর্চার বৃত্তে বিশ শতকের তিরিশের কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিলে পঞ্চাশের দশক থেকে আদিবাসী জীবন কেন্দ্রিক রচনার নতুন দিগন্ত উজ্জ্বলতর হয়। পঞ্চাশের দশকে কালীপদ ঘটকের 'অরণ্য কুহেলী' (১৯৫০), সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোড়াই চরিত মানস' (১৯৫১), পাঁচুগোপাল ভাদুড়ির 'ভাগনাডির মাঠে' (১৯৫৫) রমাপদ চোধুরীর 'অরণ্য আদিম' (১৯৫৭), সুবোধ সরকারের 'শতকিয়া' (১৯৫৮)।

ষাটের দশকে নারায়ন সান্যালে এর 'দন্ডক শবরী' (১৯৬১), সমরেশ বসুর 'দুই অরণ্য' (১৯৬৩), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য বহ্নি' (১৯৬৬), মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যঘটি গাড্ডির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭), অপারেশন? বসাই টুডু', 'শালগিরার ডাকে', 'সিধুকানুর ডাকে', সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' প্রভৃতি উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সমাজ জীবন স্পষ্ট করে তুলেছে তাদের বিস্তীর্ণ কাহিনীর পরিসরে। সত্তর ও আশির দশকে আদিবাসী সাহিত্যচর্চার বৃত্ত প্রসারিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকেরা হলেন– আব্দুল জব্বার, শক্তিপদ রাজগুরু,

দেবেশ রায়, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী প্রমুখ। এদের পর্যবেক্ষণ, ক্ষেত্রানুসন্ধান ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়েছে আদিবাসী জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি দিকগুলি। দারিদ্র্য জর্জর কালো মানুষের হাহাকার, প্রতিবাদ–প্রতিরোধ আন্দোলন, সমাজ ও সংস্কৃতি।

নব্বই এর দশক ও তারপরে বাংলা উপন্যাসের কাহিনীতে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনের চিত্র ধরা পড়েছে। এই সমস্ত উপন্যাসগুলি হল ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' (১৯৯৫), তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ' (১৯৯৫), মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের 'লালমাটি শালবন' (১৯৯৭)। একুশ শতকের রচিত উপন্যাসগুলি হলো নলিনী বেরার 'শাল মহুলের প্রেম' (২০১১), অভিজিৎ সেনের 'বহু চন্ডালের হাড়' (২০১০), গুরুদাস চক্রবর্তীর উপন্যাস ত্রয়ী– 'অরণ্যে অন্ধকার' (২০০৯), 'অরণ্যে পথহারা' (২০১২), এবং 'জঙ্গল মহলের রক্তিম সূর্য' (২০১২) উপন্যাস গুলিতে।

মূলতঃ স্বাধীনতা পরবর্তীকালের উপন্যাসে আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে আদিবাসী সাঁওতালদের সমাজ জীবন চেতনা, তাদের সমাজজীবনের অভিঘাত সমূহ অর্থাৎ শোষণ–পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ–প্রতিরোধী স্বর, সামাজিক বিন্যাসের স্তরে তাদের শ্রেনিবোধ ইত্যাদি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

## Discussion

স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের চালচিত্র বেশি করে পাই। তবে প্রাগ-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষত 'চর্যাপদ' এবং 'মঙ্গলকাব্য' গুলোতে প্রাপ্ত অন্ত্যজ ও প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলা কথা সাহিত্যের সূচনালগ্নে সেভাবে এই জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের দেখা পাওয়া যায় না। তারপর সময়ের বিবর্তনে বাংলা কথাসাহিত্যের অভিমুখ বদলে যায়। আর সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের হাত ধরে। তাই বিশ শতকে পৌঁছে কল্লোল যুগের লেখক গোষ্ঠীদের আগমনে বাংলা কথা সাহিত্যে আমরা পালাবদল দেখে থাকি। এতকাল ধরে বাংলা কথাসাহিত্য যে পথে চলতে অভ্যস্ত সেই চেনা পথে না গিয়ে এ যুগের সাহিত্যিকেরা স্বতন্ত্র একটি পথ নির্মাণ করেন। আর তাদের হাত ধরেই বাংলা কথাসাহিত্য তথা উপন্যাসে শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অন্ত্যজ এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের কথা উঠে আসে। সাহিত্যের আঙ্গিনায় যারা এতকাল ধরে উপেক্ষিত ছিল এরপর দলে দলে ক্রমে তারা ভিড় জমিয়েছে। এভাবেই বাংলা উপন্যাসে নিম্ন বর্গীয় সমাজ এবং আদিবাসী সমাজজীবনের কথা উঠে এসেছে। উপন্যাসিকেরা 'নতুন' স্বরকে এবং 'অন্য ধারার উপন্যাস' আনলেন এবং সময় ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সচেতন প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা দিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার কথা, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার এক অনবদ্য আখ্যান পেয়েছি। বাংলা উপন্যাসে এভাবেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের কথা উঠে এসেছে আঞ্চলিক উপন্যাসের হাত ধরে। প্রথমদিকের বাংলা উপন্যাসে বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতির মানুষের কথা কিছুটা পাওয়া গেলেও সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর কথা সেভাবে পাওয়া যায় না। তাদের জীবন–জীবিকা, প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই–সংগ্রামের কথা সেভাবে মেলে না। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আঞ্চলিক উপন্যাসের হাত ধরে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সমাজজীবন, লড়াই–সংগ্রামের কথা বিশদে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা–পরবর্তী নব ইতিহাস ভাবনার দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এবং লোকশ্রুতি ভিত্তিক ইতিহাস অথবা জাতির সাংস্কৃতিক জীবন–চর্চার অতীত কথাকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনায় অগ্রগণ্য লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা–পরবর্তী সময়কালে সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক হানাহানি বা সর্বস্তরে পুঞ্জিভূত হয়ে ওঠা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ–প্রতিরোধ হিসেবে ইতিহাসের কণ্ঠস্বরকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন 'অরণ্যবহ্নি'(১৯৬৬) উপন্যাসে। এই উপন্যাসের আখ্যানের প্রেক্ষিতে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সমাজজীবন, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং লড়াই সংগ্রাম প্রভৃতির প্রসঙ্গ বিশদে উপস্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসে সাওতালদের লড়াই

সংগ্রামের পিছনের নানা ইতিবৃত্তের কথা যা আজ থেকে হাজার বছর আগে অরণ্যবেষ্টিত ছোটনাগপুর মালভূমিকে কেন্দ্র করে এদের সভ্যতা গড়ে ওঠে।

> "ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম এবং মালভূম জুড়ে বাস করে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর আদিবাসী। বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণী এবং পর্যায়ে এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে, তবে জীবনযাত্রার মান এবং জীবিকা সংস্থানের উপায় প্রায় একই।" [১]

নগর সভ্যতা থেকে হাজার মাইল দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিরিবিলি–নির্জন স্থানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা নিজের মতো করে সভ্যতা গড়ে তোলে। নিজের মতো করে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে থাকবে বলে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বেশিদিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে নি। কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হতেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে এই অরণ্য অঞ্চলগুলিতে। আর তখনই রাজশক্তির সাথে এই সব আদিবাসী মানুষদের লড়াই বেঁধে যায়। 'অরন্যবহ্নি' উপন্যাসের 'কথারম্ভ' অংশে ঔপন্যাসিক আদিবাসী সাঁওতালদের  সততাকে স্বীকার করেছেন এই বলে–

> ''এরা বাঘ মারে, ভালুক মারে, কিন্তু এরা চোর নয়, লুটেরা নয়।"[২]

তবে প্রয়োজনে। প্রয়োজন ছাড়া অকারনে এরা কিছু করে না। অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে এরা বাঘ–ভালুকের সাথে সম্মুখ সমর করতেও দ্বিধা করে না। লড়াই সংগ্রাম এদের রক্ত মজ্জায়। যা বংশ পরম্পরায় বাহিত। তাই এরা সেদিন ইংরেজকেও ছাড়েনি।

'অরন্যবহ্নি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসকে ধরেছেন দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায়। একদিকে বিদ্রোহের উৎসে থাকা সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর প্রতি আর্থ–সামাজিক বঞ্চনা ও শোষণের টুকরো বিররন দিয়েছেন, অন্যদিকে জন শ্রুতিকে নির্ভর করে লৌকিক–অলৌকিক বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপনা করেছেন। যেখানে সিধু, কানু ও অন্যান্য চরিত্রের নিজস্ব ব্যথা বেদনা ও ক্ষোভ কী করে বিদ্রোহের উদগীরন ঘটালো সেই কাহিনী নির্মিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে সাঁওতালদের সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার–আচরন প্রভৃতির একটি রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের মধ্যে দুর্গাপূজা প্রচলনের যে তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, গল্প কথকের অভিজ্ঞতায় সেই অতীতের চিহ্ন উদ্ঘাটিত হয়েছে গুহার মধ্যে 'মা বোঙ্গার ঠাই' –দুর্গাপূজার স্থান দেখায়। আদিবাসী সাঁওতাল জীবনের নানারকম সংস্কারের কথা উপন্যাসে আছে। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে ঔপন্যাসিক উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের দেবভাবনাকে সংযুক্ত করে দেখিয়েছেন। তাই দেখা যায় 'মরংবোঙা' আর কালী ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের কাছে এক হয়ে গেছে। তিনি চণ্ডীর নাম লেখা তামার কবচ দিয়েছেন সিধু আর কানুকে। ভৈরবীর নির্দেশে কালী পূজাতেও অংশ নিয়েছে রুকনী, সিধু, কানু, লালমাঝি। রুকনী বুক চিরে রক্ত দিয়ে পূজা করেছে। কালীমূর্তির ভয়ংকরী রূপে তারা খুঁজে পেয়েছে নিজেদের বিদ্রোহের সমর্থন। রুকনী দুর্গাপূজায় উৎসাহ দিয়ে সিধু–কানুকে বলেছে –

> "দুগগা পূজা করে রাম রাজা রাবণকে মেরেছিল তুমরা উ পূজা কর।"[৩]

আসলে সাঁওতাল বিদ্রোহকে সর্বব্যাপী গণ–অভ্যুত্থান হিসেবে দেখাবার জন্যই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের ক্ষীণ সুত্রকে কল্পনায় বাড়িয়ে তুলেছেন। বিদ্রোহে সাঁওতালদের পরাজয়ের মূলে আছে তাদের সরল ধর্ম বিশ্বাস–এমন একটা ধারনা তারাশঙ্করের লেখায় উঠে এসেছে –

> "সাঁওতালরা হারলে অন্ধবিশ্বাসে আর কৌশলের অভাবে। ওদের বিশ্বাস ছিল দেবতার বর ওরা পেয়েছে, ওরা জিতবে। কানু, সিধু বিজয়ার দিন বলেছিল গুলি ইবার আর আমাদের গায়ে বিঁধবে না। দেবতার হুকুমে গুলি জল হয়ে যাবেক।"[৪]

এই বিশ্বাসের বশেই যজ্ঞ করতে গিয়ে অর্ধোন্মাদ রুকনী যজ্ঞের আগুনে পুড়ে মারা যায়। আধুনিক সমরাস্ত্র আর আদিবাসী সাঁওতালদের সরল ধর্মবিশ্বাসের লড়াইয়ের ফলের নিয়মেই সাঁওতালদের পরাজয় ঘটেছে।

উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতালদের গ্রাম সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের প্রধান বা মাঝির কথা ও পরামর্শ শুনে সবাই চলে এরকম ইঙ্গিত আছে লিটি পাড়ার সর্দার ভীম মাঝি এবং ভাগনাডিহির সর্দার চুনা মাঝির ক্ষেত্রে। উপন্যাসে দেখা যায় কেনারাম ভকতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবাই পরগনাইতে জমায়েত হওয়ার কথা বলেছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে আদিবাসী সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ উপন্যাসে উঠে এসেছে। নয়ন পালের কথায় উঠে এসেছে পাহাড়তলির বন কেটে সাঁওতালদের চাষাবাদের কথা। মহাজনদের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া সাঁওতালদের সমগ্র পরিবার কিভাবে 'কেনা মুনিষ'– এ পরিণত হয় তার প্রসঙ্গ এখানে আছে। রাস্তাবন্দিতে কাজ করতে গিয়ে সাঁওতালরা তাদের ধর্ম হারিয়েছে, সাঁওতাল মেয়েদের সন্মানহানি ঘটেছে। বাজার হাটে সর্বত্র সাঁওতালদের ঠকানো হত তাও ধরা পরেছে বারহেটের বাজারে আগত সিধুর কেনাকাটার বর্ণনায়। এই সর্বব্যাপী শোষণের বিরুদ্ধে 'হুল' এর ডাকে সাঁওতালেরা ফিরে পেয়েছিল আত্মবিশ্বাস, বেঁচে থাকার মন্ত্রশক্তি –

> "ক্লান্ত শ্রান্ত অত্যাচারিত জীবন, যে জীবন একবেলা একমুঠো অন্ন এবং বনজ ফল কন্দ ও শিকার করা পশুপাখির মাংস বেচে, ছিন্নমলিন বস্ত্রে আর নিজেদের সঞ্চয় করা কাঠকুটো ও আবর্জনার মধ্যে কোনরকমে কাটিয়ে এসেছে। সে জীবন আশ্চর্য পরিছন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"[৫]

এইভাবে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় শোষিত ও সর্বস্ব রিক্ত এক আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর এক জাগরণের ছবি এঁকেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবী সাঁওতাল তথা বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি শোষণ–বঞ্চনার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ও বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন এবং লেখক মহাশ্বেতা দেবী নিজেও যেন চিরশোষিত–বঞ্চিত আদিবাসীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সঙ্গে সামগ্রিক সত্তা দিয়ে মানসিক ভাবে একাকার হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর কর্মে ও সাহিত্যে সত্যিকার 'সাব–অল্টারন ইতিহাস' চর্চায় নিমগ্ন থেকে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী সাঁওতাল কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

১৯৬৬ সাল থেকে আরম্ভ করে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর লেখা–লেখিতে ইতিহাস–সমাজ ও সময়ের দলিলীকরণ করে গেছেন। তিনি সেই সময়ের দাপুটে বিনোদন–সর্বস্ব সাহিত্য ধারার চোখ রাঙানিকে অস্বীকার করে গেছেন। তিনি সচেতন ভাবে বিনোদন সর্বস্ব, বাজার মুখ্য, সাধারণ নর–নারীর প্রেম–যৌনতাময় সস্তা কাগজে প্রচারভিক্ষু লেখকদের গতানুগতিক পথ ছেড়ে অন্যধারার লেখক হয়ে উঠলেন। তাঁর আদিবাসী জীবন–কেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলো হল 'অপারেশন? বসাই টুডু' (১৯৭৭), 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'সিধুকানুর ডাকে' (১৯৮৫), 'হুলমাহার মা', 'হুল মাহা' প্রভৃতি উপন্যাস। মূলত এই উপন্যাসগুলিতে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসি সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর জীবনে বঞ্চিত-শোষিত হবার কাহিনীকে যেমন জীবন্ত করে তুলেছেন, তেমনি পুলিশ–প্রশাসন, সরকার, দিকু মহাজনের হাতে নির্যাতিত জীবনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্বরকে তুলে ধরেছেন। আদিবাসী মনুষ্যত্বের ন্যূনতম অধিকার গুলো নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন।

'অপারেশন? বসাই টুডু' সত্তর দশকের জ্বলন্ত সময়ের প্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাস। সমাজ ও সময়ের প্রহরী মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতে বহুমাত্রা যুক্ত করেছেন। নকশাল আন্দোলন মূলত গ্রামীন কৃষক জীবন সমস্যার অগ্নিগর্ভ থেকে উদ্ভব হয়েছে। লেখিকা মহাশ্বেতার 'অপারেশন? বসাই টুডু' এই মর্ম সত্যটি উপন্যাসের দলিলীকরণে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির আখ্যান কিন্তু শুধুমাত্র নকশাল আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সময়-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এই আন্দোলনের পরবর্তী কালের রাজনৈতিক সময়কে দ্যোতিত করেছে। উপন্যাসের আখ্যান শুরু হয়েছে ১৯৭৭ সালে সাঁওতাল বসাই টুডু মারা যাওয়ার খবর দিয়ে। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বসাই টুডুর চারবার মৃত্যু দেখানো হয়েছে এবং চারবারই কালী সাঁতরাকে চিহ্নিত করতে যেতে হয়েছে। উপন্যাসের আখ্যান ১৯৭৭ সাল থেকে আরম্ভ হলেও কালী সাঁতরা ও বসাই টুডুর কথাবার্তায়; আবার

কদলী সাঁতরার চিন্তার মধ্য দিয়ে বা কখনো উপন্যাসে কথক সত্তার জাগরণে নানা কাহিনীর ঘাত–প্রতিঘাতে উপন্যাসের সময় চলে যায় সত্তর–একাত্তর–বাহাত্তরের কালপর্বে এবং তারও পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কাল পরিসরে।

উপন্যাসের কাহিনী থেকে জানা যায় **১৯৪৫** সালে সাঁওতাল বসাই টুডুর সঙ্গে কালী সাঁতরার আলাপ হয়। কিন্তু বসাই **১৯৪৩** সাল থেকেই এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। **১৯৪৩** সালে ললিতাবাড়ি কনফারেন্সে খেত মজুরদের জন্য ন্যূনতম মজুরী দেবার প্রথম দাবি ওঠে এবং হুগলি কনফারেন্স খেত মজুরদের আলাদা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা হয় এবং এর ফলেই বসাই এর মনে বিশ্বাস হয়েছিল খেতমজুর–কিষান–শ্রমিক থেকে আলাদা নয়। কিন্তু অল্প দিনেই এই বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। জমিদার–জোতদার–দিকুদের কাজ কর্ম করে ন্যূনতম মজুরীটুকু পায় না খেত মজুররা। তাদের এই অধিকার চাইতে গেলে বিরোধ সংগ্রাম, দাঙ্গা–হাঙ্গামা এবং শোষণ নির্যাতন চলে। এই অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তির জন্য, সুবিচারের আশায় সংগ্রামের পথ দেখায় সাঁওতাল বসাই টুডু। **১৯৭০** সালে বসাই নিজস্ব পথে সংগ্রামের সূচনা করে এবং এই অপারেশনে তার প্রথম শিকার হয় প্রতাপ গোলদার। এই জ্বলন্ত সময় পরিসরের দ্যোতক হয়ে দেখা যায় কাহিনীর ছোট একটি বাচন–

> "বানারি। অপারেশন বানারি ১৯৭০। বৈশাখ।"[৬]

বসাই টুডু প্রতাপ গোলদারকে হত্যা করার পর পুলিশ অপারেশনে অন্য একজন মারা যায়, যাকে কালী সাঁতরা বসাই বলে চিহ্নিত করে। **১৯৭২** সালে পুনরায় বসাই টুডুর আবির্ভাব। দ্বিতীয় অপারেশন রামেশ্বর ভুঁএ্যাকে, যার পনের বিঘা বেনামী জমি, জাগুলার বাজার এবং কাঁকড়াশোলে তার ধান কল। বসাই টুডুর দ্বিতীয় অপারেশনের ঘটনাটি এরকম–

> "অপারেশন জাগুলা নামে নথিভুক্ত, কিন্তু অ্যাকচুয়েল ঘটনাস্থলটি জাগুলা সদর থেকে ছয় মাইল দূরে কাঁকড়াসোল গ্রামে ঘটে।"[৭]

রামেশ্বরের বাবাও ছিলেন অবিবেচক, প্রজাপীড়ক, বুর্জোয়া-মনোভাবাপন্ন শোষক আর কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী লোক। উপন্যাসে বসাই টুডুর তৃতীয়বার জন্ম হয়। ক্যানেলের জল না দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল সূর্য সাউ। বি. ডি. ও. সাহেবও তার সঙ্গে কথা বলে ব্যর্থ হয়। অবশেষে বসাই টুডুর আগমন এবং সূর্য সাউকে কুপিয়ে খুন করে এবং বাকুলিতে আর্মি মার্চ এবং বসাই টুডুর মৃত্যু হয়। **১৯৭৬** সালে বসাই টুডুর চতুর্থ বার আবির্ভাব ঘটে। এই পর্বের আখ্যান বিশ্বে উঠে আসে কদম মুঞা গ্রাম। গ্রামের অত্যাচারী জগত্তারন। অত্যাচারী জগত্তারনের সঙ্গে বসাই টুডুর সংঘর্ষ। চতুর্থ বার বসাই এর মৃত্যু ঘটে।

**১৯৭৮** সালে বসাই টুডুর পঞ্চম মৃত্যুতে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। মৃত্যুর খবর পেয়েই কালী সাঁতরার চিহ্নিত করতে যায় এবং দ্রৌপদীর কাছ থেকে সে জানতে পারে যে বসাই টুডু এবার পিয়ারশোল গ্রামের শোষক হরিধন সর্দারকে শাস্তি দিয়েছে। বসাই টুডুর পঞ্চম মৃত্যুতে শোকাহত কালী সাঁতরার হৃদয়ানুভবে সাঁওতাল বসাই টুডুর জীবন দর্শন উপন্যাসে দ্যোতিত হয়েছে। উপন্যাসে কালী সাঁতরা বিবেকবান চরিত্র হলেও সাঁওতাল বসাই টুডুর মতো সক্রিয় সে নয়; আর নয় বলেই –

> "আর দিব না, আর দিব না, রক্তে বোনা ধান, মোদের জান হো।"[৮]

এই কথাটি কালী সাঁতরার লাইফ স্প্যানে গানই থেকে গেল। বসাই টুডুর বার বার জন্ম মৃত্যুতে আখ্যান রূপকথা হয়ে যায় নি। কারন কাহিনীর ভিত্তিভূমি ছিল সাতের দশকের নকশাল বাড়ি আন্দোলন এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কালের ইতিহাস। আখ্যানের প্রতিটি ঘটনার বিবরণে রয়েছে বাস্তব পটভূমি এবং পরিপ্রেক্ষিত। ফলে সাঁওতাল বসাই টুডুর সংগ্রাম হয়ে যায় চিরকালের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম। একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিরকালের বঞ্চিত–প্রতিবাদী মানুষের প্রতিস্বর।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, এখনও ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী রাজনীতির চরিত্র–বৈশিষ্ট্য পাল্টায়নি। বিশেষত আদিবাসী এলাকার একথা সরবাংশে সত্য। উপন্যাসে সরকার–প্রসাশক থেকে আরম্ভ করে

জমিদার–জোতদার–মহাজনদের অত্যাচার একুশ শতকে দাঁড়িয়েও ঔপনিবেশিক আধিপত্য, শোষণ ও বঞ্চনাকে মনে করিয়ে দেয়। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখিকা বুঝিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক সময়কালের শোষণ স্বরূপ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও পাল্টায়নি। সরকার পুলিশ–প্রশাসনের সহায়তায় এমন এক স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক সমাজ তৈরি করতে চায়, যার বিরুদ্ধে 'অপারেশন? বসাই টুডু' উপন্যাসের কেন্দ্রিক নায়ক চরিত্র সাঁওতাল বসাই টুডুর কণ্ঠ নিঃসৃত প্রতিস্পর্ধী বাচন –

> "আমি একটা লতুন পথ ভাবছু। পথটা পুরানা বলেই নতুন।"[৯]

আধিপত্য ও প্রভাবের রাজনীতি যে শুধুমাত্র আদিবাসী খেতমজুরদেরই বঞ্চিত করে তা নয়, সমগ্র আদিবাসী জনসমাজকে বঞ্চিত করে। আদিবাসী জনসমাজের সমস্তরকম সরকারী সুযোগ সুবিধার জন্য পুকুর–কুয়ো– নলকূপ, রাস্তাঘাট, শিক্ষা–স্বাস্থ্যর নামে যে সব প্রকল্প এবং অর্থ বরাদ্দ মহাজন, জোতদার–সরকারী মদতপুষ্ট মন্ত্রী, নেতৃত্ব প্রদানকারী লোকজনের এলাকাতেই হয়। এমনকি আইনের রক্ষক পুলিশ প্রশাসনের দ্বারাও আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার খর্বিত হয়। 'অপারেশন? বসাই টুডু' উপন্যাসে শোষক প্রতাপ গোলদার, প্রবঞ্চক রামেশ্বর ভুএ্যা, ঠকবাজ সূর্য সাউ এবং স্বার্থান্বেষী জগত্তারন ও হরিধন প্রমুখরা উচ্চবর্গীয় শোষক চরিত্রের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী ঔপনিবেশিকতার রাজনীতির মুখোশ খুলে দিয়েছেন –

> "একদিকে থাকবে রামেশ্বর ভুএ্যারা, অন্যদিকে থাকবে, লাথের চোটে কোঁক ফাটে তো মুখ ফাটে না, এহেন চির–নাবালক চাষা।"[১০]

এভাবে কালে কালে, যুগে যুগে শাসকের–শোষকের রঙ পাল্টায়, পাল্টায় না শুধু শোষনের রঙ। মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন? বসাই টুডু' উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতাল বসাই টুডুর সশস্ত্র সংগ্রাম ঔপনিবেশিকদের সময়কালের ঔপনিবেশিকতাবাদী মানস প্রবনতার প্রতিরোধী–প্রতিবাদী স্বর এবং ঔপনিবেশিকোত্তর প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয় সচেতন সাঁওতাল তথা আদিবাসী জনমানসের জাগরণ।

মহাশ্বেতা দেবীর এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২)। উপন্যাসিক এই উপন্যাসে গণ আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও পরিসরকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক চরম সন্ধিক্ষণকে তুলে এনেছেন। আখ্যানে যে সময়কাল ধরা দিয়েছে তা ১৭৫০ থেকে ১৭৮০ সাল। সেই সময়কালে মারাঠা দস্যুর দ্বারা বাংলাদেশ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইত্যাদি এই সময়কালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী উপন্যাসের আখ্যানে উঠে এসেছে। এই সময়পর্বে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৭৫৫ সালে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলা–বিহার–উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া। এর ফলে কোম্পানী কর্তৃক সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য জোর–জুলুম বাড়তে থাকে, ফলে অতিরিক্ত সুদের চক্রবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠী ১৭৮৪ সালে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিপ্লবের আগুনে ফেটে পড়ে। উপন্যাসটিতে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী ভাগিরথীর পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় থেকে আরম্ভ করে মুঙ্গের, হাজারীবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার আদিবাসী তথা সাঁওতাল, মুন্ডা, মাল পাহাড়িয়া, লোধা, শবর জাতিগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আদিবাসী বীর সাঁওতাল মুন্ডার ছেলে তিলকা মাঝি আদিবাসীদের সমস্ত রকম শোষণ–অত্যাচার–বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য একটা শোষণমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে হুলের ডাক দিয়েছিল। শালগাছের পাতা-ছাল দিয়ে 'গিরা' গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পাঠিয়ে তামাম আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে হুল বিদ্রোহের জন্য শামিল করেছিল। আদিবাসী সাঁওতালদের জাতীয় অস্ত্র তীর–ধণুক–বর্শা–বল্লম, টাঙ্গি সহযোগে এই সশস্ত্র সংগ্রাম ইংরেজ শাসকের রক্তচক্ষুর বিপক্ষে প্রথম সংগ্রাম –

> "হু-ল বলে চেঁচিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে ক্ষ্যাপা বানের মতো ওরা বেরিয়ে এসেছিল।। মানুষ আর বেয়নেট, টাঙ্গি আর কুড়াল... ফোজের সমুদ্র যেন ঘিরে আসছে। তিলকা টাঙ্গি চালাচ্ছে। রাজমহলের মাটিতে তিলকা রক্ত দিয়ে যাচ্ছে। হুলের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছে।"[১১]

বাবা তিলকা মাঝির গুলতির আঘাতে সাহেব ক্লিডল্যান্ড নিহত হয়। এরই অপরাধে তিলকা মাঝিকে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে আনা হয় ভাগলপুরে এবং বটগাছে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আর সেইদিনই বাবা তিলকা মাঝি নিজের জীবন উৎসর্গ করে সাঁওতাল সহ অনান্য আদিবাসীর রক্তে হুলের বীজ রোপন করে দিয়েছিলেন। তিলকা মাঝির মৃত্যুতে সাময়িক ভাবে হুলের আগুন নিভলেও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এ আগুন সুপ্তঈ ছিল। একদিকে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর হাতে তীর-ধনুক, বর্শা-টাঙ্গি, কুড়ুল অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রে বলিয়ান ইংরেজ বাহিনী। এই অসম লড়াইয়ে কোন অবস্থাতেই জেতা সম্ভব নয়, তৎসত্ত্বেও কোম্পানি, মালিক, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী মানুষের রক্তে বংশ পরম্পরায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৮৫৫-৫৬ সালে সিধু-কানু, চাঁদ, ভায়রোর নেতৃত্বে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংগ্রামী মন ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভগনাডিহির মাঠে পুনরায় হুলের ডাক দেয়। 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২) উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন –

> "১৭৮০ – ১৭৮৫ খ্রীঃ বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহই প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ। সেই সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, সম্ভবত সেই প্রথম আদিবাসী বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়।"[১২]

ইতিহাসের মূল ঘটনাকে অপরিবর্তিত রেখে মহাশ্বেতা দেবী নিজের কর্তব্যবোধ এবং ইতিহাস বোধের আলোকে উপন্যাসের শিল্পরূপ তৈরী করেছেন। এভাবেই তিনি সমাজ ও সময়ের কাছে দায়বদ্ধ থেকে, ইতিহাসের কাছে ঋণী থেকে সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটিকে বিনির্মাণ করেছেন উপন্যাসের আঙ্গিকে। বিশেষত সমকালীন দেশ-কাল-পাত্রকে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে ইতিহাস। তাই সমাজের বিভিন্ন উত্থান-পতন, বিভিন্ন আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় যেমন স্থান করে নেয় তেমনিই একজন সমাজ সমীক্ষক লেখকের লেখা উপন্যাসের পাতায় স্থান করে নেয়।

মহাশ্বেতা দেবীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'সিধুকানুর ডাকে' (১৮৮৫)। সিধু-কানু মিলিত হয়ে কীভাবে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর স্বাধিকার অর্জনে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে গন আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল তারই শিল্পরূপ এই উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিধু জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চলার সময় হঠাৎই দেখে একব্যক্তি শুকনো ঘাসপাতায় চকমকি ঠুকে আগুন ধরিয়ে রাস্তার নিশানা খুঁজতে থাকে। সিধু সেই লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে জানতে  সে ধনরাম টুডু। সে ধাম পিপলা আর নগিন দাস এর কাছে তিন টাকা ঋণ করায় সাত বৎসর বিনা মজুরীতে খেটে টাকা পরিশোধ করতে পারছে না কোনো মতে। তাই সে বাধ্য হয়ে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে রাতের অন্ধকারে বন-জঙ্গলে পালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিধু ব্যক্তিটিকে গাছের নীচে দাঁড় করায় এবং দেখতে পায় ব্যক্তিটি অতিব গরীব রোগা। মাথার চুলে জট, শরীরে শুধু হাড় চামড়া, কোমরে কৌপীন, গলায় কাঠের পদক, পেটে ভাত নেই এবং চোখে ঘুম নেই। সিধু মুমূর্ষু লোকটিকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে। সিধু মুমূর্ষু আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছুই স্বজাতি দুখিয়ার কাছ থেকে জানতে পেরেছে যে সাহেব, মহাজনরা আদিবাসী সাওতালদেরকে হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে, বেগারে পরিণত করে পরাধীন করে রেখেছে। এই পরাধিনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্যই এবং সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্যই হুলের ডাক দেয়। ১৮৫৫ সালে ৩০ শা জুন ভগনাডিহির মাঠে এক বিশাল বটগাছের সামনে হাজার হাজার সাঁওতাল জমায়েত হয়েছিল। জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরের উদগীরন ঘটেছিল –

> "হুল আমাদের অধিকার ফিরে পাবার হাতিয়ার। হুল আমাদের হাতে তুলে দেবে দেশ, রাজ্য"[১৩]

স্বাধীন ও শোষণমুক্ত সাঁওতাল রাজ্য গঠন করার অভিলাষে সিধু-কানু নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কাছে জোতদার, জমিদার, ইংরেজ, মহাজন, শোষক দিকুরা পিছু হটতে থাকে। এই সংগ্রামে অনেক ইংরেজ অফিসারের মৃত্যু হয়। এরই ফলে ভাগলপুরের কমিশনার 'মার্শাল ল এন্ড অর্ডার' ঘোষণা করে যে সিধু-কানুকে হত্যা করতে পারলে নগদ দশ হাজার টাকা এৎবং অন্য সাঁওতালদের হত্যা করতে পারলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরষ্কার দেওয়া হবে।

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী 'সিধু কানুর ডাকে (১৯৮৫)' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন শোষক ইংরেজ সাহেবদের ধ্বংস করতে না পারলে আদিবাসী সমাজকে কোনোভাবেই শোষণ মুক্ত সমাজে পরিণত করা যাবে না। ঔপনিবেশিক শোষণে–শাসনে ভারতবর্ষের অর্থনীতি, কৃষি সভ্যতা ধ্বংসের পথে জেনেও উনবিংশ শতাব্দীতে নব্যচেতনায় শিক্ষিত বাঙ্গালি সব কিছু জেনেও না জানার ভান করে ছিল। ভারতবর্ষের কৃষি সভ্যতা বাঁচানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিল আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা। সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীকে একজোট করে শাসন মুক্ত–শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য সিধু ডাক দিয়েছিল –

> "তোমরা শুনেছ যে আমি ঠাকুরের আদেশ পেয়েছি। হ্যাঁ পেয়েছি। ঠাকুর বলছে, সকল জুলুমবাজকে উচ্ছেদ করো, সাঁওতাল রাজ কায়েম করো, দেলায়া বিরিদপে, দেলায়া তিংগুন পে।"[১৪]

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর সিধু মুর্ম্মুর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ,দিক থেকে শোষণ বঞ্চনার কথাই বলেছেন। সিধু আজীবন শোষণ বঞ্চনাহীন সাঁওতাল সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। উপন্যাসে সিধু মুর্ম্মুর মৃত্যুকালীন চিত্রকল্পে মহাশ্বেতা অনাগত ভবিষ্যতের সংগ্রাম–লড়াইকে বাঁচিয়ে রাখতে কৌশলে একটি নব প্রজন্মের শিশুকে উপস্থিত করেছেন। যার হাতে পবিত্র শালগাছের ডাল রয়েছে। এর দ্বারা ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী বুঝিয়ে দিয়েছেন বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত সংগ্রামী মানুষের মৃত্যু নেই। সিধুর মৃত্যুতেই যে বিদ্রোহ থেমে থাকবে, তা নয়, আগামী নতুন প্রজন্মের শিশুরা 'গিরা' নিয়ে একটা শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে রাখবে। উপন্যাসে সিধু মুর্ম্মুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইংরেজ, জমিদার, জোতদার, শোষণ মুক্ত–শাসন মুক্ত সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কানুর অবদান কোনো অংশে কম ছিল না। তাই ফাঁসির কাঠে ঝোলানোর আগে আশাবাদী সংগ্রামী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে –

> "আবার আমি আসব, আবার আসব , আবার আসব।" [১৫]

সিধু–কানুর হুলের ডাকে সাঁওতাল সমাজকে শোষণ মুক্ত করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার গণ–সংগ্রামের ইতিহাসে আদিবাসী মানুষের এই আন্দোলনকে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এই গণ সংগ্রামে সাঁওতাল ছাড়াও অন্যান্য জাতির লোকজনও অংশগ্রহণ করেছিল। আদিবাসী সাঁওতাল বিদ্রোহের একশত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মহাশ্বেতা দেবী এই ধরনের উপন্যাস লিখেছেন। আসলে ভারতবর্ষ কাগজে–কলমে স্বাধীনতা লাভ করলেও আদিবাসী সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ শবর জাতিগোষ্ঠীর মানুষ কিন্তু আজও স্বাধীন হয়নি। আজও অন্যায়–অবিচার, শোষণ–বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত হয়নি, আর তারই জন্য ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী শোষিত–বঞ্চিত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সহ বঞ্চিত মানুষের গণ সংগ্রামকে, তাদের প্রতিরোধ–প্রতিবাদী স্বরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঐতিহাসিক কাল পরিসরে কাহিনীর বয়ানে তুলে এনেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সত্তরের দশকে আদিবাসী সাহিত্য চর্চার বৃত্ত যারা প্রসারিত করলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা সাহিত্যিক হলেন আব্দুল জব্বার, সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব গুহ এবং শক্তিপদ রাজগুরু। সাহিত্যিক ও চলচিত্রকার শক্তিপদ রাজগুরু বাংলা সাহিত্যের একজন সমাজ সচেতন শক্তিমান লেখক। পূর্বসূরি লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরন করে অরণ্য ও সাঁওতাল তথা আদিবাসী সমাজ জীবনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। আবার তারাশঙ্করের সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রামীন, প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে মিশে কৃষক সমাজ জীবনের গতি প্রবাহ অভিব্যক্ত করেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর একাধিক উপন্যাসের মধ্যে অরণ্য ও আদিবাসী জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস গুলো হল – 'বনে বনান্তরে', 'কাঁসাই এর তীরে', 'কিছু পলাশের নেশা'।

লেখকের 'কিছু পলাশের নেশা' (১৯৭৮) উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সংকট মুক্তির বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধানত সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর লড়াই-সংগ্রামময় জীবন এবং সেই জীবন থেকে উত্তরণের চেষ্টা। উপন্যাসের আখ্যানে আমরা পাই আদিবাসী সাঁওতাল মাধো হেম্ব্রম একজন শিক্ষিত উদার সমাজমনস্ক যুবক। সাঁওতাল সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূর করতে তার প্রচেষ্টার তুলনা নেই। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সাঁওতাল সমাজের

বুকে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। জোতদার, জমিদার, ঠিকাদার মহাজনেরা যেভাবে সাঁওতালদের প্রতিনিয়ত শোষণ করে এবং ঠকায়। উপন্যাসে দেখা যায় গনপৎ মাহাতো একজন প্রবঞ্চক- ঠকবাজ মানুষ। সে বনের পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে সাঁওতালদের দিয়ে দামি দামি কাঠ চুরি করে এবং সেগুলি নামমাত্র মূল্যে কিনে, চড়া দামে বিক্রি করে। গনপতের চালাকি বুঝতে পারে একমাত্র মাধো হেম্ব্রম অথচ সাঁওতাল পল্লির মধ্যে মাধোর একটি স্কুল তৈরীর প্রয়াস সাঁওতাল সমাজের মাতব্বরেরা মেনে নিতে পারে না।

উপন্যাসে সাঁওতাল মাধো হেম্ব্রম একজন শিক্ষিত আদর্শবাদী সমাজসেবক। তার চেতনায় পিছিয়ে পড়া সাঁওতাল সমাজকে তুলে ধরার মহান ব্রতই সর্বদা ক্রিয়াশীল। শিক্ষিত তরুণ সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে মাধো বলেছে–

> "শুধু ড্যাম গড়ে জমিতে ফসল বাড়ালেই সব কাজ হবে না। মনের ফসল কই। সেখানে যে শূন্যি খাঁ খাঁ করছে। বাঁধ গড়ছ, কারখানা হবেক, কিন্তু মানুষ! এটা গড়ার কারিগর কইগো ?"[১৬]

মাধো হেম্ব্রমের কথায় সুকান্ত উপলব্ধি করে জীবনের চরম সত্য। শহুরে সভ্যতার জৌলুসে মানুষের অবক্ষয় ঘটেছে। স্বকীয় যন্ত্রণাবোধের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল যুবক উপলব্ধি করেছে তাদের সমাজের মানুষের জীবনে শূন্যতার বেদনা।

আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা সমাজে যে কতটা পিছিয়ে আছে তা শক্তিপদ রাজগুরুর 'কাঁসাই এর তীরে' উপন্যাসের কাহিনীতে স্পষ্ট। সুদীর্ঘকাল থেকে সমাজে যে বর্ণ বৈষম্য ও শ্রেনী বৈষম্য টিকে আছে তা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে সমাজের নানান সুযোগ সুবিধা ভোগ থেকে এখনো বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে তা এই উপন্যাসে দেখা যায়। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই শ্রেনী বিভক্ত এই সমাজ ব্যবস্থাকে তৈরী করে সুধন্য রায়ের মতো শয়তান গোছের জমিদাররা সাঁওতাল বদনদের মতো সাধারন-দুঃখী দরিদ্র আদিবাসীদেরকে সমাজে বঞ্চিত করে রাখে। তাই বদনের মুখে আমরা শুনতে পাই–

> "জীবনে আপস করবি নাই, আমারও ঘর ক্ষেতি বসতি ছিল। কিন্তু উরা, ওই লোভী মানুশগুলোন সব কেড়ে লিলেক, ঠকাই লিলেক।"[১৭]

সরলপ্রানা দরিদ্র অসহায় আদিবাসী সমাজকে কুচক্রী ক্ষমতাশালীরা যে চিরকাল বঞ্চিত–প্রতারিত করে রেখেছে শুধু তাই নয়, সদা সর্বদা তারা সাঁওতাল সহ অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের উপর অত্যাচার নিষ্পেষণ চালায়। শক্তিপদ রাজগুরু 'কাঁসাই এর তীরে' উপন্যাসটির প্রতি পদে পদে প্রমান লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় এই উপন্যাসে জমিদার সুধন্য রায়ের নারী লোলুপ স্বভাবের বিশ্রী চিত্র। বদনের স্ত্রী কিশোরীর প্রতি তার নোংরা দৃষ্টিপাত। সে বদনকে ছলনার আশ্রয়ে প্রতারিত করে জেলে পাঠায় এবং কিশোরীকে নিজের আয়ত্বে আনার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালায়। সাঁওতাল যুবতী কিশোরীকে একা পেয়ে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য শেয়াল–কুকুরের মতো সুধন্য রায় এবং তার সাকরেদরা উঠে পড়ে লেগে যায়। যার ফল স্বরূপ নিজের আত্মসম্মানকে বাঁচাতে সাঁওতাল কিশোরী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। কিশোরীর এ পরিণতি শুধু উপন্যাসের কাহিনীর কল্পনা নয়, সাঁওতাল সমাজের নারীদের এহেন দূরবস্থার বাস্তবতা রয়েছে। আদিবাসী সাঁওতাল কিশোরী দরিদ্র–অসহায় হতে পারে কিন্তু আপন ইজ্জতকে সে হারায় না। পাপী–অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে কাঁসাই এর জলে তার নিষ্পাপ দেহকে সে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই উপন্যাসটিতে নারী লোলুপ জমিদারদের লালসার বলি হতে দেখা যায় কুচি নামধারী অন্য এক নারীকে, তথাকথিত ভদ্র সমাজের সদস্য গদাই ও পটলা তাকে রাতের অন্ধকারে নির্মম ভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করে।

শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর 'কাঁসাই এর তীরে' উপন্যাসে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদনীপুর সীমান্তে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সমাজজীবনের ইতিবৃত্তকে অসাধারণ ভাব ও ভাষার দ্বারা নিখুঁতভাবে

উপস্থাপন করেছেন। সেই কারনে শক্তিপদ রাজগুরুর কলম থেকে জন্ম নেওয়া এই উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের জগতে তাঁকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

আশির দশকে আদিবাসী সাহিত্য–চর্চার বৃত্ত প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ভিড় করে এসেছেন দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, সমরেশ বসু, সুধাংশুশেখর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা। এদের পর্যবেক্ষণ, ক্ষেত্রানুসন্ধান ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পরেছে আদিবাসী সাঁওতাল জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি দিকগুলি। দ্রারিদ্র্য জর্জর, আদিবাসী মানুষদের কান্না-হাহাকার, প্রতিবাদ–প্রতিরোধী স্বর, সমাজ ও সংস্কৃতি যেভাবে ঔপন্যাসিকেরা তাদের আখ্যানে তুলে ধরেছেন তাতে আদিবাসী সাহিত্য ধারাকেই পুষ্ট করেছেন।

নব্বই এর দশক এবং তারপরে বাংলা উপন্যাসের আখ্যানে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি ও সংগ্রাম সংকল্প কাহিনীতে সাঁওতাল সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলি ধরা পড়েছে। সেই সমাজ উপন্যাসগুলি হল- ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' (১৯৯৫), তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ' (১৯৯৫)।

মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের 'লালমাটি শালবন' (১৯৯৭) নিছক একটি উপন্যাস নয়। এই উপন্যাসে আছে গতিময়তা, আবেগময়তা, নির্ভারতত্ত্ব ও তথ্য। আদিম জনগোষ্ঠী খেড়িয়া শবর সহ সাঁওতাল। উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে অথর্ব বেদের উপর বিস্তারিত আলোচনা আছে। অথর্ববেদে এমন সব ভোজবিদ্যার কথা আছে যা সাঁওতাল–শবর জাতিগোষ্ঠীর নখদর্পণে। এখনও তারা কিছু কিছু এই বিদ্যাচর্চা করে, চিকিৎসা করে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন আয়ুর্বেদের যে সব ঔষধি উল্লেখ আছে তা আদিবাসী শবর ও সাঁওতালরা জানেন। উপন্যাসের আখ্যান সূত্রে ভোগ্যপণ্য যুগের চাকচিক্যের মাঝে সমান্তরাল ভাব বহমান বনাঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতাল ও শবর জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' (১৯৯৫) উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতাল জনজীবনের মধ্যে শিক্ষিত–অশিক্ষিতের পরিচয় পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সমাজের রন্ধ্রমূলে নিহিত। এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের নামে শুরু হয় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া–লড়াই। প্রধানত এই উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের 'ডাইনীপ্রথা' র মতো ভয়ঙ্কর কুসংস্কার আছে। এই উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র ফুলমনী যাকে ডাইনী অপবাদ দিয়ে মারতে চেয়েছে তার নিজেরই স্বামী চুনারাম। শেষ পর্যন্ত আদিবাসী সাঁওতাল যুবক সুফল মুর্মুই নিষ্পাপ–সরলমতি–ফুলমনীর পাশে দাঁড়ায়। উপন্যাসের আখ্যানের পরতে পরতে সাঁওতাল সমাজ জীবনের রূপ ফুটে ওঠে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসের মধ্যে আদিবাসী সাঁওতাল জনজীবনের প্রসঙ্গ বৃহৎ ভাবে যে দুটি উপন্যাসে এসেছে সেগুলি হল– 'মহুলবনীর সেরেঞ' (১৯৯৫) এবং 'দ্বৈরথ' (২০১৪)। 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসে রাজনীতি ও লড়াইয়ের চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। উপন্যাসে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর জীবনের সংঘর্ষের চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। অন্যদিকে 'দ্বৈরথ' বিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বছরের গ্রাম বাংলার রাজনীতির ইতিহাসই হলো উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। উপন্যাসের 'পঞ্চরং' পর্বে জমিদার রাজকিশোর সিংহ ও আদিবাসী সাঁওতালদের প্রতিবাদী স্বর ফুটে ওঠে। উপন্যাসে দেখা যায় আদিবাসী সাঁওতালরা শোষণ–বঞ্চনা–অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের জাতীয় অস্ত্র তীর–ধনুক–বল্লম নিয়ে অত্যাচারী শাসক শ্রেনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

গুরুদাস চক্রবর্তী বাংলা উপন্যাসের জগতে এক প্রতিশ্রুতিমান লেখক। বাস্তব অবস্থাকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে সমাজের দূরে অন্ধকারে থাকা মূলত আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর সুখ–দুঃখ, চাওয়া–পাওয়ার কথা বলে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর সাঁওতাল কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো হল– 'অরণ্যে অন্ধকার' (২০০৯), 'অরণ্যে পথ হারা' (২০১২), 'জঙ্গলমহলের রক্তিম সূর্য' (২০১২)।

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে সভ্য সমাজ যখন আকণ্ঠ ভোগবাদে নিমজ্জিত 'স্বল্পবাসে' তারা আদিমতাকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত তখনো এই নির্জন বনভূমিকে কিছু কিছু মানুষ সমানে ভালোবাসে। বন প্রেমিক আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক চিত্র, ক্ষোভ–বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই এখনও জারি রেখেছে। 'জঙ্গল মহলের রক্তিম সূর্য' (২০১২) উপন্যাসের বিষয় হলো পাহাড় আর জঙ্গল মহলের অন্ধকারে না মরে বেঁচে থাকা কিছু

মানুষ নামক জীবনের দুঃখ-আনন্দ, পাওয়া-না পাওয়ার বর্ণনা। উপন্যাসের কাহিনীর প্রেক্ষাপট গড়ে তুলেছেন বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পশ্চিম মেদনীপুরের পশ্চিম অংশ, যা আজও গভীর জঙ্গলে ঢাকা। যেখানে আদিবাসী সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর বসবাস, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের নানা দিক। উপন্যাসের আখ্যানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অবহেলিত অনাদৃত জীবনের নানা দিক সময়ের প্রেক্ষিতে জায়গা পেয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. রাজগুরু, শক্তিপদ, শাল পিয়ালের বন, অভ্যুদয় প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, পৃ. ৪
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টাদশ খণ্ড, ১৯৫৬, পৃ. ৩২৫
৩. তদেব, পৃ. ৩৯৩
৪. তদেব, পৃ. ৩৯৫
৫. তদেব, পৃ. ৩৬৯
৬. দেবী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, অপারেশন? বসাই টুডু , দে'জ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ৩২৭
৭. তদেব, পৃ. ৩৭২
৮. তদেব, পৃ. ৪০৭
৯. তদেব, পৃ. ৩৩৮
১০. তদেব, পৃ. ৩৭৩
১১. দেবী, মহাশ্বেতা, শালগিরার ডাকে, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, দে'জ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ৪১৬
১২. দেবী, মহাশ্বেতা, ভূমিকার পরিবর্তে, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, দে'জ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ১১
১৩. দেবী, মহাশ্বেতা, সিধু কানুর ডাকে, শরৎ পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ. ৩২
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪
১৫. তদেব, পৃ. ১১২
১৬. রাজগুরু, শক্তিপদ, কিছু পলাশের নেশা, সাহিত্য সংস্থা, প্রথম প্রকাশ জ্যেষ্ঠ ১৩৮৫, পৃ. ২৪
১৭. রাজগুরু, শক্তিপদ, কাঁসাই এর তীরে, অঙ্কুর পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৩, পৃ. ৬৩

**সহায়ক গ্রন্থ :**

১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, গণ আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ, মৈত্রী প্রকাশন, ১৯৯৬
২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১
৩. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণ সংগ্রামের ইতিহাস, পাল পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৭
৪. চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, তারাশঙ্করের উপন্যাসে শ্রমজীবি মানুষ, আশাবরী পাবলিকেশন, হাওড়া, ১৯৯৭
৫. চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন, দে'জ পাব্লিসিং, কলকাতা, ২০১১
৬. দেবসেন, সুবোধ, বাংলা কথা সাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৯
৭. রহমান, আনিসূর, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নিম্নবর্গের উল্লুলান,অভিয়ান পাবলিশার্স  কলকাতা, ২০১৫
৮. দেবসেন, সুবোধ, বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০১০
৯. রায়, হিমাংশু মোহন, ভারতের আদিবাসী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৭

১০. গুপ্ত, প্রমথ, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী (ময়মনসিংহ), মনীষা, প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৯
১১. কুমার, সমাদ্দার রণজিৎ, সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৬২
১২. মিশ্র, ভগীরথ, দুটি উপন্যাস, চারনভূমি, জানগুরু,দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০১৬
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, মহুলবনীর সেরেঞ, দে'জ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৯৫
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, দ্বৈরথ, দে'জ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৪
১৫. মুখোপাধ্যায়, মহুয়া, লালমাটি শালবন, সুজন পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭
১৬. চক্রবর্তী, গুরুদাস, অরণ্যে অন্ধকার, প্রভা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১২
১৭. চক্রবর্তী, গুরুদাস, জঙ্গল মহলের রক্তিম সূর্য, সুদর্শন প্রকাশন, কল্যাণী, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১২